যোগেন-সেলিমপুর-শহীদনগর

অমিতাভ সেনগুপ্ত

আর্ট কলেজে যোগেনদার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ আলাপ ঘটে বছর দুই বাদে, আমি তখন থার্ড ইয়ারে। আমার বয়স কতো? কুড়ি। যোগেনদা আমার তিনবছরের সিনিয়ার, ফিফথ ইয়ারে। তার আগে চিনতাম দূর থেকে। ওদের ক্লাসে ছিল একটা জমজমাট গ্রুপ— সুকোমল শাসমল, সুনীল দাস, ধীরাজ চৌধুরী, আর ছিলেন অনীতাদি। সেই সময়ে সবচেয়ে বড় আলোড়ন আনলো সুনীল দাস। সম্ভবতঃ আগের বছর ললিতকলার পুরস্কার পেয়ে।

তখন একষট্টি সাল। আমার কুড়ি বছরের কৌতুহল আর বিস্ময়ের আবাহন। চলতো টুকরো টুকরো ভাবে। অনেকের সঙ্গে, আবার কতগুলি নিয়মিত চর্চার মধ্য দিয়েও। আমার মনে তখন প্রশ্ন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। কোন ধীরতা-স্থিরতা নেই। মনে আছে আমরা ছিলাম ক্লাসের চারবন্ধু—মানব, সঞ্জয়, অচিন্ত্য—ওদের আমি ক্রমাগত বিভ্রান্ত করে তুলতাম আমার প্রশ্ন নিয়ে। কিন্তু সবই থেকে যেতো এক আলো-আঁধারির রহস্যে। সেই সন্ধিক্ষণে, দূর থেকে দেখা যোগেনদা হঠাৎ কাছে এসে দাঁড়ালো। কারণটা ঘটেছিল আমার একটা লেখা নিয়ে। ছবি আঁকার বাইরে আরো যেন বিস্ময়ের খোঁজ, সঙ্গী হলাম দু'জনে।

এর আগের পর্বটাও বলা দরকার— কেমন করে পেলাম আমার একটা পালাবার ঠেক। অরণ্যে বিচরণ। আমার ডায়েরী লেখার সূত্রপাত।

আরও বছর ছয়েক আগে তখন আমি স্কুলে কুচবিহারে। রোজ বিকেলে অভ্যাস ছিল সাগর দিঘীর চারপাশ ধরে চক্কর দেওয়া। আর চলতো আপনমনে কথোপকথন। এভাবে ঘুরতাম আর শুধু অজস্র মনের কথা। সে আলাপচারিতার কোনও সঙ্গী ছিল না। হঠাৎ একদিন কাঁধে হাত পড়লো। আমার জেনকিন্‌স স্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপাল। আঁতকে উঠলাম।

আমি সঙ্গী পেলাম, অনেক অভিজ্ঞ সঙ্গী। উনি আমাকে আবিষ্কার করলেন, শিল্পী হবার অনেক স্বপ্ন আমার। আমার স্বপ্নের খোরাকে উনি যোগাতেন নানা গল্প—পিকাসো, প্যারীস স্কুল, বলশেভিক আন্দোলন, কুচবিহারের রাজা আর গ্রাম সমাজ। আবার মাঝে মাঝে অদ্ভুত প্রশ্ন ছুঁড়তেন, 'তুমি সত্যি জানো তুমি কি চাও'? ওনার সঙ্গে আমার শেষ দেখাটাও বিচিত্র। স্কুল পর্ব শেষ করে কলেজে ঢুকেছি আই.এস.সি. নিয়ে। ওনার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। এক ব্যথিত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলেন— 'ভয় পেয়ে গেলে'?

যেন সঙ্গী হারালাম। কিন্তু উনি যে পরিসরটা রচনা করেছিলেন, এক আলাপচারিতার, তা রয়ে গেল। হ'য়ে পড়ল একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ সরল বিস্ময় আর প্রশ্ন নিয়ে মৌন সংলাপ আমাকে জর্জরিত করে তুলছিল। শুরু হল ডায়েরী লেখা, অতি গোপনীয় চর্চা, কিন্তু সুন্দর একটা মুক্তি। অরণ্যের মুক্তি। ডায়েরী লেখা আর অরণ্যের মুক্তি? সে আলোচনা আপাততঃ থাক।

কিন্তু এই অরণ্যে বিচরণ থেকেই কতগুলি ব্যক্তিগত অভ্যাস তৈরী হ'ল। যেমন কাল্পনিক সিচুয়েশন এবং সেপরিবেশে বাস্তব ঘটনা নিয়ে ভাবা— এসব লেখার মধ্যে। আরও পরে, কয়েকবছর বাদে আর্ট কলেজে এরকমই একটা লেখা নিয়ে আলাপচারিতার কয়েকটা মোড় ঘুরেছিল। একটা মোড়ে এসে দাঁড়ালো যোগেনদা।

ঘটনাটা এরকম। আমাদের থার্ড ইয়ারের শুরুতে একটা হাতে লেখা দেওয়াল পত্রিকা শুরু হ'ল আর্ট কলেজে— শিক্ষক রথীন মৈত্রের তত্ত্বাবধানে এবং ছাত্র মিলন মুখোপাধ্যায়ের অলংকরনে। মিলন লিখতও 'বুলডগ' ছদ্মনামে, ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়ে নানা হাস্য-রসিকতা। সেই সঙ্গে থাকতো ওর করা কার্টুন। সমস্ত ব্যাপারটা বেশ আকর্ষণীয় হ'য়ে উঠলো। যেমন এই কার্টুন থেকেই কলেজের শ্রীকান্ত হয়ে গেল 'ডাগলাস'। কিন্তু কয়েক সংখ্যা পরে অন্য লেখা দরকার। সেই সময় আমার

একটা ছোট্ট লেখা দিলাম মিলনকে। মনে আছে, মিলন সুন্দর করে হাতে লিখে সাজিয়েছিল পত্রিকায়। এই লেখাকে কেন্দ্র করে ঘটলো তিনটে ঘটনা।

প্রথম ঘটনা আমার জীবনে অনিলবাবুর প্রবেশ। যদিও উনি আমাকে দেখেছেন সেকেন্ড ইয়ারে। অথবা তারও আগে। কিন্তু সেদিন শিক্ষক অনিল ভট্টাচার্য সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে আমাকে থামালেন। কারণ স্বভাবমতো হন্তদন্তভাবে উপরে ক্লাসে যাচ্ছিলাম। (... আরও অনেক পরে স্বাতী আমাকে দেখিয়েছিল রাস্তায় বেরোলে আমি কিভাবে হাঁটি)। উনি বললেন, 'তোমার লেখাটা দেখলাম... তোমার সংগে কথা আছে সন্ধ্যে বেলা বাড়ীতে এসো'।

সেই শুরু। অনিলবাবু আমাকে তার চেতলার স্টুডিওতে জয়েন করতে বললেন। আমি বেশ দলবল নিয়ে ঢুকেছিলাম। আমার নীচের ক্লাসের অলোক, অলোক ভট্টাচার্য ছিল।

সেই স্টুডিওতে প্রবেশ। বলা যায় শিল্পজগতে আমার প্রথম প্রবেশ। অনিলবাবু একটার পর একটা মনের জানলা যেন খুলে দিতে পারতেন। আমার আলাপচারিতার এক অসাধারণ সঙ্গী। সেই স্টুডিওতে উনি আনতেন অনেক কৃতী শিল্পীদের— অতুল বোস, সতীশ সিংহ, মাখন দত্তগুপ্ত, রথীন মৈত্র, আরও অন্য বিষয়ের কেউ কেউ। আমার একটা অসমাপ্ত ড্রইংয়ের উপর সতীশ সিংহ মশায় একটু কাজ করে রেখে গিয়েছিলেন। আমি ছিলাম না, পরে অনিলবাবু বললেন, আমাকে ওনার মেসেজ , 'ছায়া দেখতে শেখো'। রেখা আর টোনের আরেকটা জগৎ যেন খুলে গেল।...

দ্বিতীয় ঘটনা। আমার ক্লাসের অরুন্ধতী, হঠাৎ একদিন কাছে এসে বললো, 'তোমার লোখাটা কি সত্যি'? মানে? 'সত্যিই মেয়েটা ছিল, মারা গেছে?' ও এই ব্যাপার । যতটা সম্ভব ভারীকণ্ঠে, আনত চোখে বললাম, 'হু'। (কি গুল কি গুল। অরুন্ধতীর চোখে আমি হিরো। সারা শরীরে কি শিহরণ!)

কিন্তু অরুন্ধতি-সংলাপ আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগালো খুব গুরুতরভাবে। আমার আড্ডার সঙ্গী সঞ্জয়-মানব-অচিন্ত্যদের সেদিন বললাম, 'জানিস মিথ্যা, এ ব্যাপারটা অতো সহজ নয়, এটা একটা ইম্পরটেন্ট এলিমেন্ট'। ওরা তাকিয়ে থাকলো, অপেক্ষা করলো আমি আরও কিছু বলবো। কিন্তু আমি প্রবেশ করেছি আমার অরণ্যে। রাতে লিখলাম, ''মিরাকল একটা মিথ্যা, কিন্তু এই মিথ্যা ছাড়া ঈশ্বরের পুত্র হওয়া যায় না...।' সব মহান চরিত্রকে ঘিরে আছে অজস্র মিথ্যা। কল্পনা যখন বাস্তবকে তৈরী করে, সে মিথ্যা জীবনের সব নিয়ম ভেঙ্গে দেয়। দিগন্তকে বিস্তারিত করে। আমার অরণ্যে শুরু হল কত ছায়া-নাটক, সারি সারি চরিত্র, চেনা মুখ। আবার অচেনা। অরুন্ধতী-সংলাপ আমার সামনে এক উড়ন্ত পরীকে দাঁড় করালো— জীবনে এলো মেটাফর। এরপর তৃতীয় ঘটনা।

খাকি প্যান্ট, চেক-হাফহাতা শার্ট, আর কাঁধে শান্তিনিকেতনী ঝোলা। ওই ঝোলার মধ্যে আমার ড্রইং বোর্ড কাগজশুদ্ধ ঢুকে যেতো। কলেজের পর স্কেচ করতে যাওয়া ছিল দৈনন্দিন পর্ব। কখনো শিয়ালদা স্টেশনের রিফুজী , কখনো গঙ্গাপার, ময়দান অথবা নিউমার্কেট। সেদিন নিউমার্কেটে পাখীর বাজারে কাজ করছি। পিছন থেকে এলো যোগেনদা, 'তোমার লেখাটা ইন্টারেস্টিং হয়েছে'। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই লেখাটা ছাড়িয়ে আমরা এসে গেলাম আলাপচারিতায়। আবিষ্কার করলাম ছবির বাইরে জীবনের অজস্র খুটিনাটি নিয়ে, কবিতা নিয়ে, আলোচনা করা যায় আর্ট কলেজে এমন কেউ আছে।

যোগেনদা এবং জীবনের খুটিনাটি— আমার অভিজ্ঞতায় তখন এক বিশেষ যোগসূত্র। বিষয়টা বোঝানো শক্ত। যেমন, মনে আছে, কলেজ জীবনে ওদের পাড়ায় কখনো যাওয়া হয়নি। কিন্তু ওই পাড়ার জীবন, মানুষগুলি, ষাটদশকের উদ্বাস্তু জীবন, অভাব ও বাঁচার তাগিদ, সাহিত্য চেতনা—প্রায় সব দৈনন্দিন ছবি আমি দেখতে পেতাম যোগেনের কথা বলার মধ্যে। সরোজদা, নমিতা, মিহির এরা যেন আমার পরিচিতজন। অথচ কাউকেই তখনো দেখিনি।

যোগেনদার এই খুটিনাটি দেখা, এক বিশেষ অভ্যাস। বলা যায় আমাকে এক নেশায় পেয়ে বসলো। প্রথম যেদিন কফি হাউসে যোগেনদা আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল সরোজদার সাথে, লক্ষ্য করলাম সরোজদার 'ও, অমিত' বলার মধ্যে একই সুর। যেন পূর্ব পরিচিত। সরোজদা আমাকে যেন কতোদিন ধরে চেনেন। যোগেন তার কথার এক সহজ চিত্রকল্প ছড়াতে

১৯৬৫ সালে সরোজদার বাড়ির উঠোনে যোগেন সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশান্ত গাঙ্গুলী মিহির বৌদি (সরোজদার স্ত্রী) নমিতা

পারতো চারপাশে। অভিজ্ঞতার এক যোগসূত্র ঘটাতো। এক ঘটনা থেকে আরেক ঘটনার। কারণ আরও অনেক বছর বাদে এই লেখাটা লিখতে বসেছি যোগেন নয়— মিহির-নমিতার জন্যে। যোগেন অনুপস্থিত।

এই যোগেন-নেশা আমাকে পেয়ে বসেছিল আরেক কারণে। এতোদিন আমার অরণ্যের জগৎ ছিল ফ্যান্টাসি—একটা রেখা যেন ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, ঘুরে ঘুরে বাইরের দিকে। যে কোন ঘটনা থেকে মন চলে যেত অজানা দূরে। আর যোগেনের কথার জগত অজস্র খুটিনাটিতে ভরা, সাধারণ মানুষজন, সাধারণ অভ্যাস, দারিদ্র্য আর বেঁচে থাকার অজস্র ঘটনা। বাস্তব পরিবেশকে ও যেন খুব গভীরভাবে দেখতো।... খোলার চালে লাউডগায় আলো, লণ্ঠনের আলো পড়েছে নমিতার মুখে .... রেখা যেন কোন এক অন্তর্মুখী আবর্ত্তে ঘুরে ঘুরে ছুটছে। ঢাকুরিয়া -সেলিমপুরের-শহীদনগর , অলি-গলির বাঁকে যে বাস্তবতা, সেখানে যোগেন যেন খুঁজে পেয়েছিল অভিজ্ঞতার এক আত্মিক সম্পর্ক। এই বাস্তবকে ও কখনো গৌরব জর্জরিত করেনি, আবার রস-সঞ্চিত বা করুণা-কোমলও করেনি। মধ্যবিত্ত জীবনের যাবতীয় খুঁটিনাটি বারে বারে, গভীরভাবে দেখেছে হয়তো এক আত্মিক প্রয়োজনে। এই সেলিমপুর-শহীদনগর, এই মানুষজন ছাড়া যোগেন যেন পরিচয়হীন।

না, এই বিশ্লেষণটা তখন কলেজ জীবনে করিনি। এটা এখনকার, ভুলও হতে পারে। কারণ চিন্তা এখন স্মৃতি নির্ভর, ঘটনার ছোট ছোট ছবি দেখা। তার আগে পরে মাঝখানে অজস্র ঘটনার সারি। আমি দু-একটা রঙের আঁচড় কাটতে পারি আর বলতে পারি 'হয়তো-এটা যোগেনের মতো কেউ'। রাণী একবার যোগেনের ছবির পরিবেশ চিত্রিত করে সেখানে যোগেনের মুখ বসিয়েছিল— যেন শিল্পী নিজের ছবির মধ্যে। যোগেন খুব সন্তুষ্ট হয়নি, 'উউ নাঃ, এটা করার মানে হয় না'।

প্যারীসে যোগেন আমার একবছর আগে গিয়েছিল। আমি যখন গেলাম যোগেন যেন অপেক্ষাই করছিলো আমাকে। ফলে আলাপচারিতার পর্বে আবার সূত্রগাঁথা হ'ল।

কিন্তু ঠিক হ'ল না, বরং সবমিলে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে পেলাম যোগেনকে। প্যারীস এবং বিদেশী মানুষজনের সুন্দর অভিজ্ঞতার বাইরে, ভীষণভাবে বিচলিত হয়েছিলাম ভারতীয় অন্যান্য শিল্পী ও অন্যবিষয়ের ছাত্রদের দেখে। আলাপচারিতার এক বিকৃতরূপ ক্রমে প্রকট হয়ে উঠলো। আর এই পরিবেশেও আমি সবচেয়ে অবাক হয়েছিলাম যোগেনকে দেখে। বরং সেটা বলা যাক কিছুটা।

প্যারীসে সে বছর আমার সঙ্গে গিয়েছিলআরও দু'জন শিল্পী ভূষণ আর হিম্মৎ শা। ইউরোপ সম্পর্কে ওদের কি কৌতুহল ছিল জানিনা, কিন্তু ওরা ক্রমাগত সব বিষয়েই একটা স্থির মতামত প্রকাশ করতো। ক্রমে আমার মনে হল ইউরোপ সম্পর্কে এদের একটা পূর্ব-ধারণা আছে যা বাস্তব পরিবেশ পাল্টাতে পারেনি। শুধু তাই নয়, বিদেশী বন্ধুদের কাছে একধরনের

আত্মগৌরব প্রকাশ করতো — ' ওরা ভারতের প্রথিতযশা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি' । নিজের সম্বন্ধে এবং যাবতীয় বিষয়ে এরা যে মতামত পোষণ করতো তার মধ্যে একধরনের ' মেকবিলিফ' আছে। এটা শুধু ভূষণ বা হিম্মৎ শা'র বিষয় নয়, তারপর দু'বছর ধরে প্যারীসে পেয়েছি প্রকাশ কর্মকার, বিমল ব্যানার্জী, দীক্ষিত, সতীশ আরও কত।

আমার সরল কৌতুহলে যেন একটা ধাক্কা এলো। কারণ এই শিল্পীরা সব ঘটনার এক সরলীকরণ এবং নির্দিষ্ট ব্যাখ্যায় এসে যেতো। সবকিছুর মধ্যে এক 'জানি' ভাব। অন্যদিকে যোগেন ও আমার আলাচারিতার মধ্যে যে খোঁজ ও বিশ্লেষণের সম্ভাবনা ছিল তা বারে বারে এদের পরিবেশে হারিয়ে যেতো। অনেকটা সুরভঙ্গ, এবং আমার ভূমিকা হ'ল শুধু শুনে যাওয়া। এরপর আমি ক্রমাগত এদের থেকে হারিয়ে যেতে থাকলাম...

কিন্তু যোগেনের কথায় আসা যাক, সেই ছেষট্টির প্যারীস পর্বে। আমার বিস্ময়ের প্রধান কারণ নিয়ে বলি। যোগেন অতি যত্নে আমাদের সবাইকে স্টুডিওতে কফি খাওয়াত। যতদূর মনে পরে কফির বাইরে অন্য খাওয়া দাওয়ার খরচ প্রায়ই ভাগ করা হতো। কিন্তু এইসব আড্ডায় কফির খরচ যোগেনের ক্রমেই বেড়েই যেতো। শুধু শিল্পী-বন্ধুরাই নয়, অনেক সময় লন্ডন থেকে আসতো নানা ভারতীয় অতিথি,প্যারীস দেখতে চায়। এরা প্রায়ই সবাই আসতো, উৎপল বসুর নাম সূত্রে। উৎপলদার সঙ্গে তখনও আমার আলাপ হয়নি। কিন্তু 'হাংরী জেনারেশনের' পর্ব জানা ছিল কলকাতায়। এবং সেই সূত্রে ওনার সম্পর্কে এক বিশেষ কৌতুহল ছিল। যোগেন বরং ব্যক্তিগতভাবে ওকে চিনতো। আমরা দু'জনেই ওর কবিতার আলোচনা করতাম, ভাল লাগতো ব'লে। সেই সময় উৎপলদাও লন্ডনবাসী এবং অনেক বাঙ্গালী বন্ধু বরং বলবো পরিচিত জন ওর কাছ থেকে যোগেনের ঠিকানা নিয়ে এসে হাজির হতো। এদের বেশীরভাগই অতি বিচিত্রধরনের । প্রথমত দীর্ঘদিন 'লন্ডনবাসী' হবার এক অদ্ভুত অহমিকা ছিল, আর নিছক কথা বলার বাইরে শিল্প-সংস্কৃতির কোন ছাপ নেই। ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রায়ই বলতো 'কি আছে দেশে, কেন ফিরবো' ? যোগেন এদের অতি বিনয়ের সঙ্গে সেবা করতো— রান্না করে খাওয়াত, আবার কেউ কেউ থেকে গেলে নিজের বিছানাটাও দিতো।

আরেকজন ছিলেন। 'ডিকশনারীর' মতো। পৃথিবীর কোন সংবাদ তার অজানা নয়। কিন্তু কাফেতে বসে কথা বলার পর বিয়ারের দামটা প্রায়ই যোগেনকে দিতে হ'তো। এবং প্রায়ই তার কথা বলার ফাঁকে, যোগেন যদি কোন সরল প্রশ্ন তুলতো, ভীষণ রেগে যেতেন — 'সোজা তো দমদম থেকে প্লেনে চাপলে আর প্যারীসে এসে নামলে, জানবেটা কি? পড়াশুনা করো?' না, খুব কঠিন ও বিচিত্র ফরাসী লোকদের নাম করতো রণেন মজুমদার, একটাও আমরা জানতাম না। তবু এই ভারতীয়রা বারে বারে আসতো, আর যোগেন খুব বিনীতভাবে সেবা করতো।

সেবা করার কথা, সেবাই ব'লবো। শিল্পীবন্ধুরা অনেকেই অব্যবহার আর মাতলামির চরমরূপ দেখিয়েছে, আর যোগেন তাদের সামলিয়েছে। অসুস্থকে সুস্থ করেছে। আমি অবাক হতাম...

এই সাধারণতা, বলা যায় বিকারগ্রস্থ এই মানুষগুলির সেবা দিয়ে যোগেন কি কোন উত্তরণের মধ্যে গিয়েছিল? জীবনের ক্ষুদ্রতা, নীচতা, বর্বরতা, চটকবাজী — এসব রেখাকে যোগেন কি আরও গভীরভাবে চিনতে চেয়েছে? খুব সহজভাবে, কোন ভনিতা না রেখেই যোগেন বিচরণ করতে পারতো সবরকম মানুষের সমাজে। এটাও দেখেছি পরবর্তীকালে।

প্যারীসের সেই পর্বে, আমাদের কাছে কিছু নতুন বিস্ময় যেন খুলে গিয়েছিল অনেক ফরাসী/ইউরোপীয় বন্ধু-বান্ধবীদের আলাপচারিতায়। সেখানে আমাদের পারস্পরিক শ্রদ্ধাছিল, মনের গভীর আদান-প্রদান ছিল। এদের মধ্যে আমরা যেন স্বাদ পেলাম এক বৃহত্তর বৌদ্ধিক ক্ষেত্রকে। এই পরিবেশে ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র যোগেনকেই যেন সঙ্গী মনে হতো।

বিদেশে ভারতীয় ও বিদেশী বন্ধুদের সাহচর্যে যোগেন ও আমার এক বিশেষ আলাপচারিতা ছিল সমাজ নিয়ে। কোথাও যেন কোন মৌলিক অনুভূতি সবজায়গায় এক। তফাৎ কোথায়? এখানে আসতো অন্য বিষয় — যেমন ঘটনা ও মানুষ। মানুষ থেকে আসতো বিশেষ ব্যক্তি, বিশেষ নারী, টাইপ ও চরিত্র। এসব আলোচনায় যোগেনের এক বিশেষ ধরন ছিল

ব'লবার, যেমন — 'মেয়েটার খুব দুঃখু'। কি করে জানলেন? তারপর চলতো যোগেনের এক বিশেষ পর্য্যালোচনা, ওদিকের টেবিলে বসা একা-মেয়েটাকে নিয়ে।

এরপর যোগেনের সঙ্গে দেখা প্রায় তিন-চার বছর বাদে, সত্তরে। সত্তর সাল বড় দুঃসময় কোলকাতায়। যোগেনের ডাকে প্রায় পালিয়ে বাঁচলাম মাদ্রাজে। কিন্তু আবিষ্কার করলাম প্রত্যেকের জীবন আলাদা। ঘটনার স্রোতে আমাদের জীবন যেন ভিন্ন গতি নিল। আমার ক্ষেত্রে কোন স্থিরতা নেই, যেন যোগসূত্রহীন। কেন আমি মাদ্রাজে কেন আমি আবার দিল্লীতে — তা যেন কোন চাওয়া-পাওয়ার স্রোত নয়। শুধু ভেসে চলা, ফেরারও ঠেক নেই। এরই মধ্যে যোগেন যেন হাত বাড়িয়ে চেষ্টা করেছে কাছে টানার — আরও কথা আছে, শেষ হয়নি।

টাইপ, চরিত্র, নারী অথবা সমাজ। অথবা শিল্প। ঘটনা আর আলাপচারিতা। আলাপচারিতা আর জমে ওঠা প্রত্যয় — আবার ফিরে দেখা জীবনকে। ... আবার একসময় আমি বিক্ষিপ্ত হলাম। ... প্লেনের জানলা দিয়ে প্রত্যয় নয়, শুধু অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি — আফ্রিকার মাটি। আমার কি কথা ছিল এখানে আসার? না। আবার কোথায় যাবো? (অরণ্যে)।

কিন্তু যোগেন যেন বারে বারে ফিরে আসে সেলিমপুর-শহীদনগর আর, আর.কে.পল্লীর বাঁকে। ওর প্রত্যয়ের ঠিকানা হয়তো এখানেই। ও গড়ে তুলেছে কতো প্রিয়জন, ওর সাথী।